

যুগোপযোগী দাওয়াত

(আধুনিক যুগে দাওয়াত উপস্থাপনের কার্যকর পন্থা ও কৌশল)

ড. ইউসুফ আল কারজাভি (রহ.)

ভাষান্তর : মুহাম্মদ রাশেদ আবদুল্লাহ



গার্ডিয়ান

পাবলিকেশনস

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের জন্য যথেষ্ট। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর নির্বাচিত রাসূলগণ, সর্বশেষ নবি ও রাসূল মুহাম্মাদ (সা.), তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবীগণ এবং তাঁদের সুপথপ্রাপ্ত অনুসারীদের ওপর।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের টুইনটাওয়ার হামলার প্রসিদ্ধ ঘটনার পর অনেকেই লিখেছেন—বর্তমান যুগে, বিশেষত ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ব্যাপারে ইসলাম আমাদের কী বলে এবং তাদের ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও অবস্থান কেমন হওয়া দরকার, সে ব্যাপারে নতুনভাবে ভেবে দেখা উচিত!

এই ধরনের লেখার কিছু কথা যৌক্তিক ও সত্য। আবার কিছু কথা অযৌক্তিক ও ভুল। আর কিছু কথা যৌক্তিক হলেও সেগুলোর মতলব খারাপ!

যৌক্তিক ও সত্য কথার একটি হলো—আমাদের মধ্যকার কিছু ব্যক্তি এবং কতিপয় গোষ্ঠী বাড়াবাড়ি ও চরমপন্থা অবলম্বন করে থাকে। প্রধানত ভিন্ন ধর্মাবলম্বী, ভিন্ন মতাদর্শী, ভিন্ন চিন্তাচেতনাপ্রাণী এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের ব্যাপারে।

আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা যে, আমি যখনই লেখালেখির জগতে প্রবেশ করেছি, তখন থেকেই তিনি আমাকে বাড়াবাড়ি এবং সকল প্রান্তিকতার স্রোতের বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করার তাওফিক দিয়েছেন।

বাড়াবাড়ি ও চরমপন্থা অবলম্বন প্রকৃতির দাবিমতে অপছন্দনীয় এবং শরিয়্যার দৃষ্টিতেও তা নিন্দনীয়। এখনকার সময়ে যেহেতু মানুষ দূরত্ব ঘুচিয়ে কাছাকাছি চলে এসেছে; এমনকি সকল মানুষ একই জনপদবাসীর মতো হয়ে গিয়েছে, তাই এসব আরও বেশি নিন্দনীয়।

এ কথাও সত্য—নিত্যনতুন সৃষ্ট অবস্থা ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে মানুষকে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি, অবস্থান এবং ইজতিহাদ সম্পর্কে নতুন করে ভাবা দরকার। কেননা, আলিমগণ বলেছেন, (ফতোয়ার) মূল কারণ ও ভিত্তির পরিবর্তনের দরুন ফতোয়ায় পরিবর্তন আসা অপরিহার্য। তবে শরিয়্যার স্থির, অপরিবর্তনীয় ও স্বীকৃত নীতিমালাকে উপেক্ষা করার অবকাশ নেই; যেগুলো স্থান-কালের পরিবর্তনের কারণে পরিবর্তিত হয় না।

নতুন করে ভাবার ফলে কিছু কিছু বক্তব্যে পরিবর্তন আসতে পারে। বক্তব্যের ধরন বদলে যেতে পারে। একইভাবে কোনো বিষয়ের অগ্রাধিকার বিন্যাস পরিবর্তন হতে পারে।

এ কথাও সত্য—বহু একনিষ্ঠ মুসলিম আছেন, যারা কিনা এ পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং এর প্রতি আহ্বান করেন। খোদ ইউরোপ-আমেরিকায়ও এমন মানসিকতার কিছু ভাই রয়েছেন, যাদের ঈমান ও দীনদারির ব্যাপারে আমরা আশ্বস্ত এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তাচেতনাও আমাদের দৃষ্টিতে সঠিক।

ভুল আর বাতিল দাবিসমূহের একটি হলো—কিছু মানুষ এ দাবি করে, আমরা নিজেদের জন্য নতুনভাবে একটি ধর্ম গঠন করব, যার মধ্যে আমেরিকা ও তাদের মিত্রদের চাহিদা অনুসারে আমরা সংযোজন-বিয়োজন এবং পরিবর্তন-পরিবর্ধন করতে থাকব। সুতরাং আমরা আমাদের ধর্মীয় শিক্ষা কারিকুলামে পরিবর্তন আনব এবং ধর্মীয় বিধিবিধান পালটে দেবো, যেন আমেরিকা আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়।

কিন্তু তারা তো সন্তুষ্ট হওয়ার নয়। যতদিন না আমরা আমাদের ধর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হব, ততদিন তারা আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَدَكْثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ-

‘(হে মুসলিমগণ) কিতাবীদের অনেকেই তাদের কাছে সত্য পরিস্ফুট হওয়ার পরও তাদের অন্তরের ঈর্ষাবশত কামনা করে, যদি তোমাদেরকে তোমাদের ঈমান আনার পর পুনরায় কাফির বানিয়ে দিতে পারত!’^১

আরেক আয়াতে তায়ালা বলেন—

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ-

‘ইহুদি ও নাসারা তোমার প্রতি কিছুতেই খুশি হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মের অনুসরণ করবে।’^২

কোনো কোনো আরব-ইসলামি দেশে তো ইতোমধ্যে এ নীতি অবলম্বন করা হয়েছে—তারা ‘উৎস নিঃসরণ’ শিরোনামে ধার্মিকতার ইতিবাচক উৎসমূল তথা মুসলিম ব্যক্তিত্ব, মুসলিম মনন ও মুসলিম মানসিকতা গঠনকারী বিষয়াবলিকে রহিত করে দেবে। একজন মুমিনের অন্তরে ঈমানি শক্তি, সাহসিকতা, ধর্মীয় মর্যাদাবোধ, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ এবং সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করার চেতনা সৃষ্টিকারী প্রতিটি বিষয়ের বিলোপ সাধন করে যাচ্ছে।

বিশুদ্ধ ইসলাম প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামি আদর্শের পূর্ণাঙ্গ অনুসারী মানুষ গড়ে তোলার লক্ষ্যে পরিচালিত সকল দাওয়াতি কার্যক্রমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। তা ছাড়া আরও উৎসাহিত করেছে কুসংস্কার, কবর-মাজার ও তথাকথিত সুফিবাদসর্বস্ব ইসলামকে। কারণ, এ ইসলাম তাদের সম্পর্কে নির্লিপ্ত। কেননা, সর্বদা তারা নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। আর রাষ্ট্রের অনাচার-অবিচার ও বিচ্যুতির ব্যাপারে একেবারেই নীরব।

আমরা দ্বীনি দাওয়াতের সংস্কার, উন্নতি সাধন, দৃষ্টিভঙ্গি, ধরন, বিষয়বস্তু, বাহ্যিকরূপের দিক থেকে আরও সুন্দর এবং আরও উৎকৃষ্টরূপে তুলে ধরার বিষয়টিকে স্বাগত জানাই। মুসলিম তো সর্বদা সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্টতাকেই খুঁজে বেড়ায়।

এই সময়ে দ্বীনি দাওয়াতি পদ্ধতির পরিবর্তন আনার প্রতি যে অনবরত আহ্বান করা হচ্ছে, এর ভয়াবহতা সম্পর্কেও আমরা উম্মাহকে সতর্ক করতে চাই। বিশেষত, ওই কলম চালনাকারীদের

^১ সূরা বাকারা : ১০৯

^২ সূরা বাকারা : ১২০

থেকে, যাদের কাছে ধর্ম ও ধার্মিক জনগোষ্ঠী কোনো গুরুত্ব রাখে না। যাদের চিন্তাচেতনা কিংবা বাস্তব জীবনে আল্লাহ তায়ালা ও আখিরাতের কোনো স্থান নেই। যারা আল্লাহর সন্তোষ-অসন্তোষের কোনো পরোয়া করে না; বরং তারা মার্কিন প্রভুকে সন্তুষ্ট করা এবং তাদের মাধ্যমে কিছু পার্থিব অর্থ ও মর্যাদা লুফে নেওয়ার ব্যাপারে বেশ আগ্রহী ও যত্নবান।

এ সময়ে কিংবা এই উন্মত্ততার মাঝে কোনো ধরনের পরিবর্তন আনার মাঝে দুটি আশঙ্কা রয়েছে—

এক. এর দ্বারা অস্ত্রবল, ধনসম্পদ, বিজ্ঞান ও কূটনীতিতে সমৃদ্ধ মার্কিনশক্তির উপর্যুপরি চাপ ও পরিকল্পনার সামনে নতিস্বীকার করা হবে। সুতরাং আমাদের মধ্য থেকে যারা সাড়া দেওয়ার, তারা এতে ভয় আর আশা নিয়ে সাড়া দেবে। তখন আমাদের এমন একটি মার্কিন ইসলাম উপহার দেবে, যাতে আল্লাহ তায়ালায় চেয়ে আঙ্কেল স্যামকে^৩ সন্তুষ্ট করার গুরুত্ব বেশি থাকবে।

দুই. এতে ধর্মদ্রোহী গোষ্ঠী নিজেদের আমদানিকৃত দৃষ্টিভঙ্গি ও আরোপিত চিন্তাচেতনার প্রসার ঘটানোর মাধ্যমে আগামী প্রজন্মকে পরিচালনা করার সুযোগ পাবে। তা ছাড়া সংস্কার ও অগ্রগতি সাধনের নামে এগুলো হবে ধর্মের ক্ষতি ও ধ্বংস সাধন। মোটকথা, আমরা দুটি স্রোতের ভয় করছি, যার একটি অন্যটির চেয়ে অধিক ভয়াবহ ও আশঙ্কাজনক। যেমন :

বাড়াবাড়ি, অতিরঞ্জন ও চরমপন্থার স্রোত

আল্লাহ তায়ালা উম্মতের জন্য যে বিষয়গুলোকে প্রশস্ত রেখেছেন, তারা সেগুলোকে সংকীর্ণ করে দিতে ইচ্ছুক। আর যে বিষয়গুলো সহজ করে দিয়েছেন, তারা সেগুলোর ক্ষেত্রেও কঠোরতা আরোপ করতে আগ্রহী। সমগ্র বিশ্বকে তারা নিজেদের শত্রুরূপে দাঁড় করায় এবং সমগ্র মানবজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে; যদিও তারা মুসলিমদের সাথে সন্ধি ও চুক্তিবদ্ধ থাকে। মুসলিম বা অমুসলিম কাউকেই তারা বিন্দুমাত্র ছাড় দিতে প্রস্তুত নয়।

ধর্মের ব্যাপারে ছাড়াছাড়ি ও আদর্শবিচ্যুতির স্রোত

এ শ্রেণিটি প্রবৃত্তিকে নিজেদের প্রভু বানিয়ে নিয়েছে। তারা কোনো মূলনীতির ধার ধারে না। শরণাপন্ন হয় না কোনো শরয়ি দলিলের। কোনো গ্রহণযোগ্য ইমামের অনুসরণও তারা করে না। ইসলামের ইমামদের ছেড়ে পাশ্চাত্যের নেতাদের অনুসরণ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। সুতরাং আদর্শের দারস তারা পশ্চিমাদের থেকেই গ্রহণ করে, তাদের ওপর নির্ভর করে এবং দিনশেষে তাদের কথায়ই ওঠে-বসে।

তাই আলিম, দাঈ এবং মধ্যমপন্থার প্রতি আহ্বানকারীদের দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, অস্থিতিশীল এই ফিতনার যুগে এবং সর্বদিক থেকে উন্মত্তকে আচ্ছন্ন করে নেওয়া ভীতিকর পরিবেশের মাঝেও নিজেদের মতামত প্রকাশ করবে। পাশাপাশি নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরবে এবং নিজেদের দাওয়াতকে বিস্তারিত আকারে উম্মাহর সামনে উপস্থাপন করবে। এক্ষেত্রে তারা

^৩ আঙ্কেল স্যাম (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদ্যক্ষর) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার বা দেশের একটি সাধারণ জাতীয় ব্যক্তিরূপ। যা ইতিহাস অনুসারে ১৮১২ সালের যুদ্ধের সময় ব্যবহৃত হয়েছিল, সম্ভবত স্যামুয়েল উইলসনের নামে নামকরণ করা হয়েছিল। মূলত এর উৎস হলো একটি কাহিনি থেকে। উনিশ শতকের গোড়ার দিক থেকে আঙ্কেল স্যাম আমেরিকান সংস্কৃতিতে মার্কিন সরকারের একটি জনপ্রিয় প্রতীক এবং দেশপ্রেমিক আবেগের প্রকাশ।—সম্পাদক

সত্যের ওপর দৃঢ় ও অটল থাকবে এবং আল্লাহর মজবুত রজ্জুকে আঁকড়ে ধরবে। কেননা, এটা তাদের ওপর আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ-

‘যারা আল্লাহর প্রেরিত বিধানাবলি মানুষের কাছে পৌঁছে দেয় এবং তাঁকেই ভয় করে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে তারা ভয় করে না।’^৪

আরেক আয়াতে আল্লাহ বলেন—

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَبِيْعٌ عَلِيمٌ-

‘এরপর যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে, সে এক মজবুত হাতল আঁকড়ে ধরল, যা ভেঙে যাওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই। আর আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও সবকিছু জানেন।’^৫

একটি সন্দেহাতীত ও স্পষ্ট বাস্তবতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আর তা হলো—৪০ বছর বা ততোধিককাল যাবৎ আমাদের জন্য দ্বীনি দাওয়াত এবং ইসলামের বিধিবিধান এক ও অভিন্ন রয়েছে। এর মধ্যে কোনো ধরনের পরিবর্তন আসেনি।

সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালায়, তিনিই আমাকে নিজ অনুগ্রহে মধ্যমপন্থার পথ দেখিয়েছেন এবং মধ্যমপন্থা অবলম্বনের তাওফিক দ্বারা ধন্য করেছেন। তখন আমি শরিয়ার যে বিধান গ্রহণ করেছিলাম, আজও আমাদের জন্য সে বিধানই প্রযোজ্য। আমি মনে করি, মধ্যমপন্থাই ইসলামকে সঠিকভাবে প্রকাশ করে। আর আল্লাহ তায়ালা এই পন্থার প্রশংসা করে বলেছেন—

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا-

‘এভাবেই আমি তোমাদের এক মধ্যমপন্থি উম্মত বানিয়েছি।’^৬

মধ্যমপন্থার মূলকথা হলো—সকল জিনিসকে ইনসাফের সাথে পরিমাপ করা এবং তাতে কোনো ধরনের কমবেশি না করা; যার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন—

وَالسَّاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْبِيزَانَ- أَلَّا تَظْغَرُوا فِي الْبِيزَانِ- وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْبِيزَانَ-

‘আর তিনি আকাশকে উঁচু করেছেন, তাতে তুলাদণ্ড স্থাপন করেছেন (এবং এ নির্দেশ দিয়েছেন) তোমরা পরিমাপে জুলুম করো না, ইনসাফের সাথে ওজন ঠিক রাখো এবং পরিমাপে কম দিয়ো না।’^৭

^৪ সূরা আহজাব : ৩৯

^৫ সূরা বাকারা : ২৫৬

^৬ সূরা বাকারা : ১৪৩

^৭ সূরা আর-রহমান : ৭-৯

আমি এ গ্রন্থে যা লিখব, তা নতুন কিছু নয়। ৯/১১-এর ফলও নয়। যার ফলে পাঠক এতে আমার পুরোনো গ্রন্থাবলির অনেক উদ্ধৃতি দেখতে পাবেন। তবে নতুন বিষয় হলো—অনেক মুসলমান, যারা এতকাল মধ্যমপন্থার স্রোতের বিরোধিতা করে এসেছেন, তারাই আজ মধ্যমপন্থার দিকে আহ্বান করছেন এবং এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছেন। এমনকি কোনো কোনো শাসকও ইতঃপূর্বে এই মধ্যমপন্থার বিরোধিতা করেছেন এবং এর প্রবক্তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। তারাও আজ এ বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করছেন এবং একে আঁকড়ে ধরার প্রয়োজন বোধ করছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

فَلِلَّهِ الْحُكْمُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ- وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ-

‘মোদাকথা, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আকাশমণ্ডলীর মালিক, পৃথিবীর মালিক এবং জগৎসমূহের মালিক। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে সকল গৌরব তাঁরই। তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।’^৮

ভূমিকা শেষ করার পূর্বে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমেরিকা ও পশ্চিমা মুসলমানদের প্রতি এ আহ্বান জানিয়ে আসছে— তারা তাদের দ্বীনি দাওয়াতের ব্যাপারে নতুন করে ভেবে দেখুক। এই পরিবর্তন সাধনের জন্য তারা দৌড়ঝাঁপও করছে। কিন্তু কেউই তাদের প্রতি এ আহ্বান জানায় না, তারাও নিজেদের নীতিতে পরিবর্তন আনুক। খ্রিষ্টান ডানপন্থি দল, যা বর্তমান আমেরিকার নেতৃত্ব দেয় এবং এর রাজনৈতিক ছক আঁকে, এ দলটিও প্রান্তিকতার শিকার ও উগ্রবাদী।

জিমি কার্টার থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত মার্কিন সকল প্রেসিডেন্ট ডানপন্থি দলের সমর্থক। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ ডানপন্থি উগ্রবাদকে পেশিশক্তির জোরে বাস্তব রূপ দান করেছে। সে তো এ কথাও বলেছে—‘আমার প্রভু আমাকে উসামা বিন লাদেনকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন, তাই তাকে হত্যা করেছি। আমার প্রভু আমাকে সাদাম হুসাইনকে মারার নির্দেশ দিয়েছেন, তাই তাকে মেরেছি।’

তার ভাবখানা এমন—যেন সে একজন নবি, যার কাছে প্রত্যাদেশ পাঠানো হয়! এ উগ্রবাদী ডানপন্থি দলটিই জালিম জবরদখলকারী জায়নবাদীদের জুলুম আর জবরদখলের পৃষ্ঠপোষকতা করে যাচ্ছে। সহিংসতা ও রক্তপাতের মাধ্যমে জবরদখলকৃত ভূমির সুরক্ষা দিয়ে যাচ্ছে। ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর চালানো জুলুম-নির্যাতনের পক্ষে সমর্থন, অর্থ, অস্ত্র ও ভেটো দ্বারা সহযোগিতা করছে।

এ সবকিছুই তারা নিজেদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও ইজতিহাদের ভিত্তিতে করছে। তাদের ধর্মই তাদের কাছে এ জুলুম, জবরদখল, পাপ ও সীমালঙ্ঘনে সহযোগিতা করার বিষয়টিকে সুশোভিত করে তুলেছে।

সুতরাং পাতি বুশ আর ডানপন্থিরা কেন নিজেদের সে দৃষ্টিভঙ্গি ও ইজতিহাদের ব্যাপারে ভেবে দেখে না, যা তাদের অপরাধ ও অপরাধীদের সমর্থন করার দিকে ঠেলে দেয়। ফিলিস্তিনিদের

জানমাল, সন্তান-সন্ততি, ঘরবাড়ি, শস্যখেত; বরং জীবনের সকল ক্ষেত্রে আপতিত কষ্ট ও মুসিবত থেকে দৃষ্টি সরিয়ে রাখতে উদ্বুদ্ধ করে।

একইভাবে ইহুদিদের প্রতি কেন আহ্বান জানানো হয় না—তারাও নিজেদের ধর্মীয় নীতির ব্যাপারে ভেবে দেখুক; যা তাদের ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের জবরদখল, ফিলিস্তিনবাসীকে তাদের ভূখণ্ড থেকে অন্যায়ভাবে উৎখাত করে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিতাড়িত করতে এবং ফিলিস্তিনের অবশিষ্ট অধিবাসীকে ক্ষেপণাস্ত্র, জঙ্গি-হেলিকপ্টার ও ট্যাংক দ্বারা হত্যা করতে উসকে দেয়। আর এর ফলেই তারা নৃশংস, নির্দয়ভাবে হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে।

তারা বর্তমানে যা যা করছে, তাদের পূর্বপুরুষেরা বিগত ১৯ শতাব্দীকাল কেন করেনি, যখন রোমকরা তাদের নির্মমভাবে হত্যা করেছে এবং ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে? কেন তাদের পূর্বপুরুষেরা হাজার বছর কল্লিত ঐশ্বরিক প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে উদাসীন ছিল; আর এই প্রজন্মেরই-বা কীভাবে সেই কল্লিত ঐশ্বরিক প্রতিশ্রুতির কথা মনে পড়ে গেল?

যারা মুসলমানদের তাদের দ্বীনি দাওয়াতের ব্যাপারে নতুন করে ভেবে দেখার নসিহত করে, তাদের প্রতি আমি আশা করব—তারা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের প্রতিও তাদের ধর্মীয় নীতি সম্পর্কে ভেবে দেখার আহ্বান জানাবে। আর দাবি তুলবে তাদের প্রতি উপাস্যতা বর্জনের। এটাই বরং ন্যায়নিষ্ঠা ও সাম্যের দাবি।

আমরা বহুকাল আগে থেকেই দ্বীনি দাওয়াত ও ধর্মীয় বিধান সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করে এসেছি। যদিও এটা আমাদের ধর্মের আহ্বানেই করেছি; জর্জ ডব্লিউ বুশ কিংবা অন্য কারও আহ্বানে নয়। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক।

ইউসুফ আল কারজাভি
দোহা, কাতার

সূচিপত্র

দাওয়াত কি পরিবর্তনযোগ্য	২৩
দ্বীনি দাওয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য কী	২৩
যুগের পরিবর্তনের কারণে দ্বীনি দাওয়াতে পরিবর্তন আসে কি না	২৫
কুরআনুল কারিম : দ্বীনি দাওয়াত পরিবর্তনযোগ্য হওয়ার দলিল	৩০
দ্বীনের সংস্কারসাধন বৈধ	৩২
ইসলামি রেনেসাঁকে সঠিক পথে পরিচালিত করা	৩৪
কুরআনের ভাষায় দ্বীনি দাওয়াত	৩৫
দ্বীনি দাওয়াতের আদর্শ রূপরেখা	৩৭
বিশ্বায়নের যুগে দ্বীনি দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য	৭৫
দাঈদের কর্তব্য	৯৩
আল্লাহকে বিশ্বাস করবে কিন্তু মানুষকে অস্বীকার করবে না	৭৭
ওহির প্রতি ঈমান ও বিবেককে কার্যকর রাখা	৯৫
বস্তুজগৎকে উপেক্ষা নয় : আধ্যাত্মিকতার প্রতি আহ্বান	১১৯
আধ্যাত্মিকতার মর্ম	১২০
বস্তুজাগতিক দিককে উপেক্ষা না করা	১২৫
পৃথিবীকে আবাদ করার প্রতি গুরুত্ব প্রদান	১২৫
ভালো সম্পদ সৎ ব্যক্তির জন্য কতই-না উত্তম	১২৮
পবিত্র জিনিস ভোগ করা	১৩৪
শরীরের প্রতি যত্নবান হওয়া	১৩৬
দাঈদের কর্তব্য	১৩৮
ইসলামের প্রতীকী ইবাদতগুলোর প্রতি গুরুত্বারোপ	১৪১
ইসলামের সর্বাধিক গুরুত্ব এক আল্লাহর ইবাদতের প্রতি	১৪১
আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য ইবাদতই আত্মশুদ্ধির একমাত্র পথ	১৪৩
নৈতিক চরিত্র এবং উন্নত গুণাবলি ঈমানের সুফল	১৪৬
ইসলামি নৈতিকতার ব্যাপকতা	১৫০
ইসলামি নৈতিকতা সর্বজনীন	১৫১
দাঈদের কর্তব্য	১৫৩
আকিদা-বিশ্বাসে গর্ববোধ : উদারতার সঙ্গে ভালোবাসা বিলানো	১৫৬
ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি উদার মনোভাব পোষণ	১৫৯
দ্বীনি উদারতার বিশ্বাস ও বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি	১৬১

অমুসলিমদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের নীতি	১৬৫
ভালোবাসার দাওয়াত	১৭০
দাঈদের কর্তব্য	১৭৪
বাস্তবতাকে উপেক্ষা নয় উন্নত জীবনাদর্শের প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ	১৭৫
আনন্দ ও বিনোদন : ভুলে না যাওয়া অবিচলতার দাওয়াত	১৮৬
সর্বজনীনতা লালন : ভোলা যাবে না আঞ্চলিকতা	১৯৪
বিশ্বায়ন ও সর্বজনীনতা	১৯৮
আঞ্চলিক বাস্তবতার প্রতি গুরুত্ব প্রদান	২০১
দাঈদের কর্তব্য	২০৪
মৌলিকত্বকে আঁকড়ে ধরে যুগোপযোগী হওয়া	২০৬
যুগোপযোগিতার বৈশিষ্ট্য	২০৭
সংস্কারসাধন	২০৮
পরিবর্তনশীলতা ও অগ্রগতি	২১১
উপকরণে অগ্রগতি : লক্ষ্য হবে এক ও অপরিবর্তনীয়	২১২
দাঈদের কর্তব্য	২১২
অতীতকে না ভোলা : ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টিপাত	২১৪
কুরআন ও ভবিষ্যৎ	২১৪
নবিজি এবং ভবিষ্যৎ	২১৮
অতীত ভোলা যাবে না	২২১
দাঈদের কর্তব্য	২২৪
ফতোয়ার ক্ষেত্রে সহজতা এবং দাওয়াতের ক্ষেত্রে সুসংবাদনীতি	২২৫
ফতোয়াসংক্রান্ত বিষয়ে সহজতাকে প্রাধান্য দেওয়া	২২৫
মৌলিক নীতিমালা : নমনীয়তা পরিহার্য	২৩০
দাওয়াতের ক্ষেত্রে সুসংবাদনীতি গ্রহণ করা	২৩০
দাঈদের কর্তব্য	২৩২
ইসলামের নীতিমালাকে লঙ্ঘন না করে ইজতিহাদ	২৩৫
সামসময়িক বিষয়ে ইজতিহাদ করার রূপরেখা ও নীতিমালা	২৩৯
দাঈদের কর্তব্য	২৪৫
জিহাদকে সমর্থন; সন্ত্রাসকে না	২৪৭
প্রত্যাখ্যানযোগ্য সন্ত্রাস এবং অপরিহার্য ত্রাস সৃষ্টি	২৪৭
সন্ত্রাস একটি বৈশ্বিক সমস্যা	২৫২
শরিয়াহসম্মত জিহাদ এবং তার মর্ম	২৫৩

জিহাদ ও কিতালের মাঝে পার্থক্য	২৫৩
জিহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	২৫৫
জিহাদের বিভিন্ন স্তর	২৫৫
দাওয়াত ও তাবলিগের জিহাদ	২৫৬
ধৈর্য ও অবিচলতার জিহাদ	২৫৭
জীবিকার জন্য চেষ্টা করাও জিহাদ	২৫৮
উম্মাহর বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক সক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলাও জিহাদ	২৫৯
সশস্ত্র যুদ্ধও জিহাদের অন্তর্ভুক্ত	২৬০
ইসলামের সন্ধিপ্ৰিয়তা	২৬৫
দাঈদের কর্তব্য	২৬৭
নারী ও পুরুষের প্রতি সুবিচার	২৬৯
মানুষ হিসেবে ইসলাম নারীর প্রতি সুবিচার করে	২৭০
কন্যা হিসেবে নারী	২৭৭
স্ত্রী হিসেবে নারী	২৭৮
মা হিসেবে নারী	২৮৪
সমাজের অংশ হিসেবে নারী	২৮৫
দাঈদের কর্তব্য	২৮৬
সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষা	২৮৮

দাওয়াত কি পরিবর্তনযোগ্য

দ্বীনি দাওয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য কী

দ্বীনি দাওয়াত পরিবর্তনযোগ্য কি না—আলোচনার পূর্বে জেনে নেওয়া দরকার এখানে দ্বীনি দাওয়াত দ্বারা মূলত কী উদ্দেশ্য?

আমার মতে দ্বীনি দাওয়াত দ্বারা ওই বক্তব্য উদ্দেশ্য, যা অমুসলিমদের ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্যে পেশ করা হয়। আবার এ শিক্ষামালাও উদ্দেশ্য, যা মুসলিমদের ইসলাম শিক্ষা দেওয়ার জন্য এবং সে অনুযায়ী গড়ে তোলার জন্য উপস্থাপন করা হয়। চাই তা বিশ্বাস হোক কিংবা জীবনবিধান, ইবাদত হোক বা লেনদেন, চিন্তাচেতনা হোক বা জীবনচারণ।

অথবা এভাবেও বলা যেতে পারে—দ্বীনি দাওয়াত দ্বারা ওই বিধিবিধান ও শিক্ষামালা উদ্দেশ্য, যা মানুষ, মানবজীবন এবং বিশ্বের সমস্যাগুলির ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান ব্যাখ্যা করার জন্য পেশ করা হয়। চাই তা হোক ব্যক্তিগত সমস্যা বা সামাজিক সমস্যা; আধ্যাত্মিক সমস্যা বা জাগতিক সমস্যা; বুদ্ধিবৃত্তিক সমস্যা বা আচরণগত সমস্যা। তা ছাড়া দ্বীনি দাওয়াতের বিশেষত্ব হলো—এটি সর্বজনীন ও সর্বব্যাপী।

এ দাওয়াত ব্যক্তির জন্য; ব্যক্তির দেহ, বিবেকবুদ্ধি, আত্মা ও মননের জন্য। এ দাওয়াত পরিবারের জন্য; স্বামী-স্ত্রী, পিতা-পুত্র, ভাই-বোন ও আত্মীয়স্বজনের পারস্পরিক সম্পর্কের জন্য। সমাজের সকল শ্রেণির জন্য; ধর্মীয়, জাতিগত, ভাষাগত ও অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পর্কের জন্যও এ দাওয়াত।

এ দাওয়াত অন্তর্ভুক্ত করে উম্মাহকে; উম্মাহর বিভিন্ন জাতি ও ভূখণ্ডকে। এখানে উম্মাহ দ্বারা উদ্দেশ্য—উম্মাতুল ইজাবা তথা ইসলামের আহ্বানে সাড়া প্রদানকারী উম্মাহ। আল্লাহ যাদের মধ্যমপন্থি উম্মাহ বানিয়েছেন এবং এক উম্মাহ বলে গণ্য করেছেন।

এ দাওয়াত অন্তর্ভুক্ত করে রাষ্ট্রকে, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতারণিত কিতাব ও তুলাদণ্ড দ্বারা মানুষকে শাসন করবে, মানুষের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবে, দ্বীনকে সুরক্ষা দেবে এবং ধর্মের আলোকে জগৎকে পরিচালনা করবে; কিন্তু দুনিয়ায় বড়োত্ব প্রকাশ করতে কিংবা ফ্যাঁসাদ সৃষ্টি করতে চাইবে না।

ইসলামের দাওয়াত বিশ্বজনীন। ইসলাম বিশ্বকে দাওয়াত দেয়, গুনাহ ও সীমালঙ্ঘনের কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য। ইসলামের দাওয়াত খোদাভীতির কাজে সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করে। পৃথিবীতে স্বচ্ছাচার ও ঔদ্ধত্যের মোকাবিলা করে। পাশাপাশি ওই সকল নিপীড়িত দুর্বল নারী-পুরুষ ও শিশুদের পৃষ্ঠপোষকতা করে, যারা নিজেদের প্রতাপশালীদের নিপীড়ন ও নিপীড়নকারীদের প্রতাপ থেকে রক্ষা করতে পারে না।

ইসলামের দাওয়াত নিরেট দ্বীনি বিষয়ের; যার সম্পর্ক বিশ্বাস এবং অদৃশ্য বিষয়াবলির সাথে কিংবা ইসলামের প্রতীকী ইবাদতের সাথে। ইসলাম সব সময় নৈতিকতার কথা বলে; যার সম্পর্ক উচ্চ মূল্যবোধ, উৎকৃষ্ট গুণাবলি এবং উন্নত মানবিক আচরণের সাথে।

ইসলাম সামাজিক বিষয়াবলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুতরাং ইসলাম সমাজকে বস্তুবাদ, স্বৈচ্ছাচারিতা ও ভোগবাদের অতল গহ্বর থেকে মুক্ত করে। সমাজ থেকে দারিদ্র্য, মূর্খতা ও রোগব্যাদি দূরীভূত করে। সমাজকে চারিত্রিক অধঃপতন, নৈতিক অবক্ষয়, সামাজিক বৈষম্য ও স্বৈচ্ছাচারিতা থেকে পবিত্র করে তোলে। এ ছাড়াও লক্ষ করলে দেখা যায়, এগুলোতে সাধারণত বস্তুবাদী সমাজগুলোই ডুবে থাকে।

ইসলাম বুদ্ধিবৃত্তিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যাবলির প্রতি মনোযোগ দেয়। ইসলামি শিক্ষার আলোকে সেগুলোর সমাধান পেশ করে। সুতরাং ইসলামের দাওয়াত কেবল আধ্যাত্মিক বিষয়াবলি ও অদৃশ্যের ওপর ঈমান আনার মাঝে সীমাবদ্ধ নয়; যেমনটি কিছু মানুষ বোঝাতে চায়।

সর্বজনীন হওয়ার বিবেচনায় ইসলামের দাওয়াতের যথেষ্ট গুরুত্ব ও প্রভাব রয়েছে। তাই যদি কোনো অপরিপক্ব ব্যক্তির হাতে এ দাওয়াতের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়, যে কিনা এ দায়িত্বপালনের জন্য প্রয়োজনীয় কৌশল অবলম্বনের যোগ্যতা রাখে না। অর্থাৎ, যে দ্বীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করেনি এবং যুগ ও বাস্তব জগৎ সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করতে পারেনি, এমন ব্যক্তি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে এবং না জেনে নিজের মতো করে দাওয়াতি পরিক্রমা চালাবে। আর বলি হতে থাকবে আমাদের দুর্দশা-জর্জরিত সমাজ ও ইসলাম ধর্ম। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

দ্বীনি দাওয়াত উপস্থাপনের জন্য আধুনিক ও প্রাচীন বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। যেমন : ভাষণ, বক্তৃতা, পাঠদান, মতবিনিময়, প্রবন্ধ, বইপুস্তক, সভা-সেমিনার, সরেজমিন গবেষণা, সাংবাদিক-তদন্ত, রেডিও-টেলিভিশন প্রোগ্রাম, নাট্যকর্ম ইত্যাদি। এক্ষেত্রে গদ্য-পদ্য, লোক-কবিতা, গল্প-উপন্যাস, নাটকলিখন ইত্যাদির ব্যবহারও করা যেতে পারে।

একইভাবে সামসময়িক মিডিয়া বা ডিভাইস ব্যবহার করে ইন্টারনেট বা স্যাটেলাইট চ্যানেলে লিখিতভাবে কিংবা অডিও-ভিডিও আকারেও প্রচার করা যেতে পারে।

এ দাওয়াত কখনো আসে দীক্ষামূলক দাওয়াতের ভাষায়, কখনো আসে আইনের ভাষায়, আবার কখনো আসে বুদ্ধিবৃত্তিক দর্শনের ভাষায়। তবে এক্ষেত্রে দাওয়াতের ভাষার প্রতিই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং দ্বীনি দাওয়াত উপস্থাপনের ক্ষেত্রে এটাই মূল ও স্বাভাবিক পদ্ধতি।

যুগের পরিবর্তনের কারণে দ্বীনি দাওয়াতে পরিবর্তন আসে কি না

পূর্ববর্তী যুগসমূহে ইসলামের যে দাওয়াত ছিল, বিশ্বায়নের^৯ এ যুগে কি ইসলামের সে দাওয়াত পালটে যাবে? ইসলাম কি প্রতিটি যুগের জন্য আলাদা আলাদা দাওয়াত উপস্থাপন করে? দ্বীনি

^৯ বিশ্বায়নের মর্ম বোঝার জন্য দ্রষ্টব্য লেখকের গ্রন্থ *আল মুসলিমুন ওয়াল আওলামা*, পৃ. পৃ. ৯-১৭

দাওয়াত কি পোশাকের মতো যে, শীতকালের জন্য এক পোশাক আর গ্রীষ্মকালের জন্য ভিন্ন পোশাক! শহুরেদের জন্য এক পোশাক আর গ্রাম্য বেদুইনদের জন্য ভিন্ন পোশাক! এক পেশাদারীর জন্য এক পোশাক আর অন্য পেশাদারীর জন্য ভিন্ন পোশাক?

ইসলাম ধর্ম কি স্থির নয়? তাহলে ইসলাম ধর্মের দাওয়াত কেন বিভিন্ন কারণে পরিবর্তিত হয়? কেন তা বিচিত্র রূপ ধারণ করে? এ প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া আমাদের ওপর আবশ্যিক।

উত্তর হলো—ধর্ম মৌলিক বিষয়াদি এবং আকিদা, ইবাদত, নৈতিকতা এবং বিধিবিধানসংক্রান্ত মূলনীতিগুলোর ক্ষেত্রে স্থির ও অপরিবর্তনীয়। তবে দ্বীনের শিক্ষাদান এবং দাওয়াতের কলাকৌশল পরিবর্তনশীল।

ইসলামের প্রখ্যাত ইমাম ও ফকিহগণের সিদ্ধান্তমূলক রায় হলো—স্থান-কাল, প্রচলন ও অবস্থার পরিবর্তনের ফলে ফতোয়া পরিবর্তিত হয়। তা ছাড়া ফতোয়া তো শরিয়ার বিধিবিধানের সাথে সম্পৃক্ত। সে মতে স্থান-কাল, প্রচলন ও অবস্থার পরিবর্তনের ফলে ইসলামের দাওয়াত ও বার্তায় পরিবর্তন আসাটা খুব স্বাভাবিক।

সুতরাং একজন মুসলিমকে যে দাওয়াত দেওয়া হবে, একজন অমুসলিমকে একইভাবে দাওয়াত দেওয়া হবে না।

একজন নওমুসলিমের সামনে যে দাওয়াত উপস্থাপন করা হবে, একজন প্রবীণ মুসলিমের জন্য সে দাওয়াত উপস্থাপন করা যাবে না।

পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামের অনুসারী একজন মুসলিমের জন্য যে দাওয়াত, একজন নীতিবিচ্যুত ও রবের অবাধ্য মুসলিমের জন্য সে দাওয়াত নয়।

দারুল ইসলামে বসবাসরত একজন মুসলিমের জন্য যে দাওয়াত, অমুসলিম সমাজে বসবাসরত একজন মুসলিমের জন্য সে দাওয়াত নয়।

যুবকদের জন্য যে দাওয়াত, বৃদ্ধদের জন্য সে দাওয়াত নয়।

নারীদের জন্য যে দাওয়াত, পুরুষদের জন্য সে দাওয়াত নয়।

ধনীদের জন্য যে দাওয়াত, দরিদ্রদের জন্য সে দাওয়াত নয়।

শাসকগোষ্ঠীর জন্য যে দাওয়াত, প্রজাদের জন্য সে দাওয়াত নয়।

উপসাগরীয় অঞ্চল বা উচ্চ মিশরের কোনো জনপদ কিংবা পাকিস্তানের কোনো পল্লিতে দাওয়াতের ভাষা ও ধরন যেমন হবে, মহাকাশ চ্যানেলের মাধ্যমে উপস্থাপিত দাওয়াতের ভাষা ও পদ্ধতি তেমন হবে না।

মানুষের পারস্পরিক দূরত্ব ও সংযোগ-বিচ্ছিন্নতার যুগে দাওয়াতের ধরন যেমন ছিল, যোগাযোগ বিপ্লবের মাধ্যমে পুরো বিশ্ব এক জনপদের রূপ ধারণ করার যুগে দাওয়াতের ধরন তেমন হবে না।

বিশ্বায়ন শব্দের এ অর্থটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ, সমগ্র বিশ্ব কাছাকাছি এসে এক জনপদের মতো হয়ে যাওয়া।

নিঃসন্দেহে কিছু সর্বজনস্বীকৃত মূল্যবোধ এমন রয়েছে, যেগুলো সকলকে বলা যায় এবং সেসব বিষয়ে সম্বোধন করা যায়। তথাপি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের আলাদা আলাদা কিছু বিশেষত্ব থাকে। তাই একজন আলিম ও দাঈর কর্তব্য হলো— প্রত্যেক সম্প্রদায়কে আলাদাভাবে সম্বোধন করবে, তাদের জিজ্ঞাসার জবাব দেবে, তাদের সমস্যার সমাধান করবে এবং তাদের সংশয় দূর করে দেবে।

এ কারণেই নবিজি যখন আনসারি সাহাবি মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.)-কে ইয়েমেনে পাঠান, তখন তাঁকে বলেন—‘তুমি এক আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছ। সুতরাং তাদের প্রতি তোমার প্রথম দাওয়াত যেন এ সাক্ষ্য প্রদানের হয়—আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই।’^{১০}

এ হাদিসের শুরুতেই নবি (সা.) বলেছেন, তুমি আহলে কিতাব এক সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছ...

হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.)-এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন—‘এ কথাটি নবিজি দিকনির্দেশনার ভূমিকাস্বরূপ বলেছেন, যেন মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) তা বিশেষভাবে স্মরণ রাখেন। কারণ, আহলে কিতাবদের মধ্যে কিছুটা শিক্ষাদীক্ষা ছিল। তাদের মূর্খ মূর্তিপূজকদের মতো সম্বোধন করা সমীচীন নয়; বরং তাদের সম্বোধন করার ক্ষেত্রে বেশি সতর্কতা কাম্য।’^{১১}

এ হিসেবে বিশ্বায়নের যুগ পূর্ববর্তী সময়ে আমাদের যে দাওয়াত এবং এর ধরন ছিল, বাস্তবিক অর্থে বিশ্বায়নের বৈশিষ্ট্যসংবলিত কোনো নতুন যুগ এলে তাতে কিছুটা পরিবর্তন আসা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

অনেক ক্ষেত্রে এমন হতে পারে, বিশ্বায়নের যুগ আসার পূর্বে আমাদের দাওয়াত স্থানীয় পর্যায়ে ছিল। অর্থাৎ, যখন আমরা ক্ষুদ্র পরিসরে নিজেদের মাঝে কথা বলতাম, যেখানে বিশ্ব আমাদের দেখত না, আমাদের কথা শুনতে পেত না এবং জ্ঞানগত সৃষ্টি ও দাওয়াতি কার্যক্রমের ফলাফল সম্পর্কে অবগতি লাভ করতে পারত না।

নিঃসন্দেহে উক্ত দাওয়াত ও তার ধরন আপন স্থানে সঠিক, যেখানে আমাদের নিজেদের লোকেরা নিজেদের ঘরে আলোচনা করছে এবং তাদের ন্যূনতম ধারণাও নেই, এ বক্তব্য কেউ শুনতে পারে বা কারও মাথাব্যথার কারণ হতে পারে! এ দাওয়াতের বিষয়বস্তু কিংবা প্রসঙ্গ কাউকে আহত করতে পারে, কাউকে কষ্ট দিতে পারে কিংবা কারও জন্য ভীতির কারণ হতে পারে।

একবার একটি মুসলিম রাষ্ট্রে বিশাল এক ইসলামি কনফারেন্সে আমি অংশগ্রহণ করি। সেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রায় ৫০০ জন ব্যক্তি উপস্থিত হয়েছিল। সেখানে জনৈক আলোচক কনফারেন্সের মূল প্রসঙ্গ থেকে বের হয়ে এমন কিছু কথা বললেন, যা সকলকে অবাক করল। তিনি বলেন—আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বা সকল ধর্মাবলম্বীকে কাছাকাছি নিয়ে আসার কোনো সুযোগ নেই। কেননা, পৃথিবীর বুকে একমাত্র ধর্ম হলো ইসলাম। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

^{১০} সহিহ বুখারি : ১৩৯৫, ১৪৯৬, ১৪৫৮; সহিহ মুসলিম : ১৯

^{১১} ফাতহুল বারি : ৩/৩৫৮ হাদিস নং : ১৪৯৬

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ-

‘নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট দ্বীন হলো ইসলাম।’^{১২}

পৃথিবীর বুকে একমাত্র আসমানি ধর্ম হলো ইসলাম। ইসলাম ছাড়া আর কোনো আসমানি ধর্ম নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ-

‘যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম অবলম্বন করতে চাইবে, তার থেকে সে ধর্ম কখনো কবুল করা হবে না।’^{১৩}

কনফারেন্সের সভাপতি আমার পাশেই ছিলেন। আমি তাকে বললাম, এ বক্তা মারাত্মক কথা বলেছেন। যদি এ বক্তব্যকে খণ্ডন না করা হয় কিংবা এর প্রতি নিন্দা জানানো না হয়, তাহলে এর অজুহাতে পুরো কনফারেন্সের চিত্র এবং এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বিকৃতভাবে তুলে ধরা হতে পারে। তিনি উত্তর দিলেন—এটা তো তিনি আমাদের মধ্যেই বলেছেন, যা এ সেমিনার হল অতিক্রম করবে না। আমি বললাম, আপনার এ কথা দুই কারণে গ্রহণযোগ্য নয়।

এক. এখানে কেউ শুধু নিজেকে বা বিশেষ কোনো গোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে কথা বলছে না, যারা তাদের আলোচনা একটি বদ্ধ হলের ভেতরে সীমাবদ্ধ রাখতে সক্ষম। কেননা, এখানে অনেক সাংবাদিক এবং বিভিন্ন রেডিও ও টেলিভিশনের প্রতিনিধি রয়েছে, যারা এ কনফারেন্সের প্রতিটি কথাকে পৃথিবীর দিগ্দিগন্তে পৌঁছে দেবে।

দুই. ওই বক্তার দাবিও বাস্তবিক পক্ষে সঠিক নয়। কারণ, পৃথিবীতে ইসলাম ছাড়াও বহু ধর্ম রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ-

‘তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন এবং আমার জন্য আমার দ্বীন।’^{১৪}

যে আয়াত দ্বারা সে দলিল পেশ করেছে, সে আয়াতই তার দলিলকে খণ্ডন করে। আল্লাহ তায়ালা আরেক আয়াতে বলেন—

قُلْ يَٰ أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ-

‘তুমি বলে দাও, হে আহলে কিতাব! তোমরা নিজেদের দ্বীন নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না।’^{১৫}

এ ছাড়া আমরা ধর্ম নিয়ে সংলাপ ও মতবিনিময় করতে আদিষ্ট। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ-

^{১২} সূরা আলে ইমরান : ১৯

^{১৩} সূরা আলে ইমরান : ৮৫

^{১৪} সূরা কাফিরুন : ৬

^{১৫} সূরা মায়দা : ৭৭

‘আর তাদের সাথে বিতর্ক করবে সর্বোত্তম পন্থায়।’^{১৬}

অনেক সময় এ ধরনের বক্তব্যের দ্বারা অন্যদের প্রতি তাচ্ছিল্য, গুরুত্বহীনতা, অসম্মান ও অবমূল্যায়ন প্রকাশ পায়। মুসলিম উম্মাহর ব্যাপারে তাদের অবস্থান এবং ইসলামের শত্রুদের পক্ষাবলম্বনের কারণে কখনো কখনো এ বক্তব্য তাদের প্রতি ক্ষোভ ও ঘৃণায় পরিপূর্ণ থাকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অন্যদের সম্পর্কে যথেষ্ট অবগতির অভাবে এমনটি হয়ে থাকে। এ কারণেই আরবগণ বলে থাকেন—‘যে ব্যক্তি কোনো জিনিস সম্পর্কে অজ্ঞ হয়, সে তার বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়।’

যাহোক, এগুলো আমাদের দ্বীনি দাওয়াত; তা হোক মৌখিক কিংবা লিখিত বক্তব্য নিয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনা করার অবকাশ সৃষ্টি করে এবং প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, আমাদের দাওয়াত কি যুগোপযোগী হচ্ছে? এর মাধ্যমে কি পূর্ণ জ্ঞানের সাথে আল্লাহর দিকে দাওয়াত সম্পন্ন হচ্ছে? এ বক্তব্য কি উপযোগী ভাষায় এবং স্থান-কালের সাথে সংগতিপূর্ণ ধারণা নিয়ে উপস্থাপন করা হচ্ছে? ইত্যাদি।

এ কথা সর্বজনস্বীকৃত, মতাদর্শের ভিন্নতার কারণে দ্বীনি দাওয়াত ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। একজন সুফির দাওয়াত একজন হাদিসবিদের দাওয়াত থেকে ভিন্ন হয়। একজন কালামশাস্ত্রবিদের দাওয়াত উপরিউক্ত দুজনের দাওয়াত থেকে আলাদা হয়। আর একজন ফকিহর বক্তব্য তাদের সকলের দাওয়াতের চেয়ে ভিন্ন হয়।

সুনির্দিষ্ট মাজহাবের অনুসারী একজনের বক্তব্য, মাজহাব অনুসরণের বন্ধন থেকে মুক্ত একজন ফকিহর বক্তব্যের চেয়ে ভিন্ন হয়।

তাসাউফের ঘোর বিরোধী কোনো দাঈর বক্তব্য, তাসাউফের পক্ষিল বিষয়গুলো বর্জন করে স্বচ্ছ বিষয় গ্রহণকারী একজন দাঈর বক্তব্যের চেয়ে ভিন্ন হয়।

পূর্বসূরিদের থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানসম্ভারের মাঝে আবদ্ধ একজন দাঈর বক্তব্য ওই ব্যক্তির বক্তব্য থেকে আলাদা হবে, যার চক্ষু আপন যুগ, সে যুগের সভ্যতা ও প্রবণতাগুলো দেখার সুযোগ লাভ করেছে।

যে দাঈ কখনো নিজ শহর থেকে বের হয়নি, তার বক্তব্য ওই দাঈর বক্তব্যের চেয়ে ভিন্ন হওয়া একেবারেই স্বাভাবিক, যে কিনা দিগ্দিগন্ত চেষ্টে বেড়িয়েছে এবং বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী, ধর্ম, মতাদর্শ ও সভ্যতা সম্পর্কে জানার সুযোগ লাভ করেছে! দ্বীনি দাওয়াত বিচিত্র হওয়ার পেছনে এটিও অন্যতম একটি কারণ।

যদিও উপরিউক্ত মতাদর্শী আলিমদের স্বীকৃত মূলনীতি হলো—তারা কুরআনের সুস্পষ্ট অর্থবাহী আয়াত ও বিশুদ্ধ হাদিস থেকে নির্দেশনা গ্রহণ করেন এবং পূর্বসূরি আলিমদের ঐকমত্যের ওপর নির্ভর করেন। কেননা, মুসলিম উম্মাহ কখনো ভ্রান্তির ওপর ঐকমত্য পোষণ করবে না।

সুফির আধ্যাত্মিকতা, হাদিসশাস্ত্রবিদের দলিলনির্ভরতা, কালামশাস্ত্রবিদের যুক্তি এবং ফকিহর জ্ঞানগভীরতা—আমার দৃষ্টিতে এগুলোই দাওয়াতের সর্বোত্তম পন্থা। প্রত্যেকের নিকট যে ভালো ও

উত্তম বিষয়গুলোর রয়েছে, আমরা আমাদের দাওয়াতে সেগুলোর মাঝে সুন্দর ও সুসামঞ্জস্য সমন্বয় ঘটাব।

কুরআনুল কারিম : দ্বীনি দাওয়াত পরিবর্তনযোগ্য হওয়ার দলিল

পারিপার্শ্বিকতা ও অনুঘটকের পরিবর্তনের ফলে দ্বীনি দাওয়াত পরিবর্তিত হতে পারে। এর শক্তিশালী দলিল হলো স্বয়ং কুরআনুল কারিম। আমরা দেখতে পাই, নবিজির মাক্কি জীবনে তথা মদিনায় হিজরত করার পূর্বে কুরআনের বক্তব্যের যে ধরন ছিল, হিজরতপরবর্তী মাদানি জীবনে এসে এতে পরিবর্তন এসেছে। এটা কুরআনের গবেষকদের নিকট বিদিত ও স্বীকৃত। মক্কা আর মদিনায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের বিষয়বস্তুর পার্থক্যগুলো বোঝা যায়—মাক্কি ও মাদানি সূরা চিহ্নিত করে আলাদাভাবে পাঠের মাধ্যমে।

মক্কায় অবতীর্ণ হওয়া সূরাগুলোতে মৌলিকভাবে আকিদা-বিশ্বাস দৃঢ়করণের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, তাতে তাওহিদ, তাওহিদের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা, রাসূল (সা.)-এর নবুয়ত সাব্যস্তকরণ, পরকালের প্রতিদান, অদৃশ্যের প্রতি ঈমান, ভালো কাজ ও উন্নত চারিত্রিক গুণাবলির প্রতি আহ্বান; এ লক্ষ্যে বিভিন্ন নবি-রাসূল ও মুমিনদের ঘটনা বর্ণনা করা এবং বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তি খণ্ডনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে মদিনায় অবতীর্ণ সূরাগুলোতে মৌলিকভাবে একটি ঈমানি গুণসমৃদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং এর জন্য বিধান প্রবর্তনসংক্রান্ত আলোচনা করা হয়েছে। এ কারণেই মক্কায় অবতীর্ণ হওয়া সূরাগুলোতে **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** শব্দ ব্যবহার করা হয়নি।

যার ফলে একটি সমাজে যে সকল বিষয়ের প্রয়োজন, সে সকল বিষয় তথা ইবাদত, লেনদেন, বিধিবিধান প্রবর্তন, দণ্ডবিধি নির্ধারণ—এই সংক্রান্ত আলোচনা মাদানি সূরাগুলোতে পাওয়া যায়।

এমনিভাবে মাক্কি সূরাগুলোর বক্তব্যের ধরনও মাদানি সূরাগুলোর বক্তব্যের ধরন থেকে ভিন্ন। মাক্কি সূরাগুলোর বক্তব্যে কঠোরতা, উত্তাপ, দ্ব্যর্থহীনতা— কিছু অত্যাৱশ্যকীয় বিষয়ের পুনরাবৃত্তি বেশি, যেমনটি আপনি সূরা শুআরা, কামার, আর-রহমান ও মুরসালাতে লক্ষ করলে দেখতে পাবেন। আরও লক্ষ করবেন—সূরাগুলোতে কুরআনুল কারিম মানুষের অন্তরকে সম্বোধন করেছে, অনুভূতিকে স্পর্শ করেছে, দাস্তিক, উদ্ধতচারীর মোকাবিলা করেছে এবং বিরুদ্ধবাদীদের দাঁতভাঙা জবাব দিয়েছে।

পক্ষান্তরে মদিনায় অবতীর্ণ আয়াতগুলোর বক্তব্যের ধরন এর থেকে বেশ আলাদা। এ আয়াতগুলো শিক্ষামূলক, বিধান প্রবর্তনমূলক, স্বস্তিদায়ক এবং এগুলো মৌলিকভাবে বিবেককেও সম্বোধন করেছে। কেননা, এর মূল বিষয়বস্তুই তো শিক্ষাদান ও বিধান প্রবর্তন। অবশ্য এ আয়াতগুলো যে অন্তরের প্রতি একেবারেই সম্বোধন করেনি; এমন নয়।

মাক্কি সূরাগুলোর চেয়ে মাদানি সূরাগুলোর বক্তব্য এবং বক্তব্যের ধরন আলাদা হওয়ার রহস্য হলো, মক্কা ও মদিনা উভয় স্থানে বক্তব্যের ক্ষেত্রে কুরআনুল কারিম সম্বোধিত ব্যক্তি আর অবস্থার প্রতি লক্ষ রেখেছে। কুরআন মক্কায় প্রধানত সম্বোধন করেছে মুশরিকদের। যারা একত্ববাদের বিরোধিতা করত, নবিজির নবুয়তকে অস্বীকার করত এবং ধৃষ্টতা প্রদর্শন করত নবিজির প্রতি। যার ফলে এ সূরাগুলোতে কঠোর ও উত্তপ্ত ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে মাদানি সূরায় কুরআন সম্বোধন করেছে সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী নওমুসলিম—তাদের প্রতি বিভিন্ন আদেশ, নিষেধ, নির্দেশনা ও বিধান প্রদানের জন্য। তাই এ সূরাগুলোতে সাধারণত কোমল ও শিক্ষাদানের জন্য সংগত ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। যে ব্যক্তি মাদানি সূরা (যেমন : সূরা বাকারা) ও মাক্কি সূরা (যেমন : সূরা শুআরা) পাঠ করবে, সে সূরা দুটির বিষয়বস্তু ও বর্ণনার ধরনে স্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করবে।

দ্বীনের সংস্কারসাধন বৈধ

দ্বীনি দাওয়াতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, একে সুশোভিত করে উপস্থাপন করা এবং আরও সুন্দর-উপযোগী এবং স্থান-কাল-পাত্রের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করে তুলে ধরা বৈধ; কাম্যও বটে। এর বৈধতার দলিলস্বরূপ নিম্নোক্ত হাদিসটি উপস্থাপন করা যেতে পারে। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন— ‘আল্লাহ তায়ালা এ উম্মাহর কল্যাণার্থে প্রত্যেক শত বছরের শিরোভাগে এমন ব্যক্তিকে পাঠাবেন, যিনি কিনা দ্বীনের সংস্কারসাধন করবেন।’^{১৭}

আমি একজন সামসময়িক বড়ো দাঈকে উপরিউক্ত হাদিসটি এ যুক্তিতে প্রত্যাখ্যান করতে শুনেছি—দ্বীন হলো স্থির ও অপরিবর্তনীয়; সংস্কারযোগ্য নয়। আর তাজদিদে দ্বীন বা দ্বীনের সংস্কারের কী অর্থ? আমরা কি কুরআনের পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত কোনো নতুন সংস্করণ বের করব? কুরআন তো সব ধরনের সংযোজন-বিয়োজন এবং পরিবর্তন-পরিবর্ধনের উর্ধ্বে। সুতরাং দ্বীনের সংস্কারসাধনের কোনো অর্থ হতে পারে না।

আমার মত হলো, উপরিউক্ত হাদিসটি বেশ কয়েকজন ইমাম সহিহ বলেছেন। তাই এ ধরনের যুক্তি দাঁড় করিয়ে প্রত্যাখ্যান করা ঠিক নয়। এটি সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত গোষ্ঠী তথা বিদআতি এবং চিন্তাচেতনায় ভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের নীতি। যারা কুরআন-হাদিসের ভুল ব্যাখ্যা করে এবং এর এমন কিছু অর্থ দাঁড় করায়, যা যুক্তি ও দ্বীনের আলোকে সঠিক নয়; বরং এক্ষেত্রে সঠিক পন্থা হলো— আমরা সহিহ হাদিসকে মেনে নেব। পাশাপাশি শাস্ত্রীয় ও ধর্মীয় স্বীকৃত নীতিমালার আলোকে এর গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা করব।

দলিল অনুযায়ী আমরাও এখন বলতে পারি, উপরিউক্ত হাদিসটি সহিহ। কারণ, ইমামগণ একে সহিহ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। অতএব, এ হাদিস থেকে আমরা গুরুত্বপূর্ণ একটি মূলনীতি অনুসরণ করতে পারি। তা হলো—দ্বীনের সংস্কারসাধন বৈধ ও শরিয়াহ স্বীকৃত। কিন্তু কাজিফত সেই সংস্কারসাধনের অর্থ কী? এর অর্থ—শরিয়ার শাস্ত্বত ও অপরিবর্তনীয় বিষয়াদি তথা আকিদা-বিশ্বাস, ইবাদত; মৌলিক উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট গুণাবলিসংক্রান্ত বিধান এবং অকাট্য আর দ্ব্যর্থহীন দলিল দ্বারা প্রমাণিত বিধিবিধান। এগুলো স্থান-কাল ও ব্যক্তির পার্থক্যের কারণে পরিবর্তিত হয় না এবং এর কোনো সংস্কারও চলে না। সব সময় অভিন্ন ও অপরিবর্তিত থাকবে। এসবের মাধ্যমে

^{১৭} সুনানে আবু দাউদ : ৪২৯১; আল মুসতাদরাক লিল হাকিম : ৮৫৯২; মারিফাতুস সুনান ওয়াল আসার : ৪২২; হাফেজ যাইনুদ্দিন ইরাকি (রহ.), হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.), হাফেজ সাখাবি (রহ.)-সহ অনেক মুহাদ্দিস হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

মুসলিম উম্মাহর বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানসিক ঐক্য এবং আচরণগত অভিন্নতা অবশিষ্ট থাকবে। উম্মাহ বিচ্ছিন্নতা ও বিলীনতা থেকে সুরক্ষিত থাকবে।

এসব চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয় বিষয়াবলির মধ্যে কোনো ধরনের পরিবর্তন আনার সুযোগ নেই। তবে হ্যাঁ, এগুলো উপস্থাপনের ধরন এবং শিক্ষাদানের পদ্ধতির পরিবর্তন আর উন্নয়নসাধন সম্ভব।

শরিয়ার যে সকল বিষয় চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয় নয়, সেগুলোতে ইজতিহাদের মাধ্যমে সংস্কার করার সুযোগ রয়েছে। শরিয়ার অধিকাংশ বিধানই এ প্রকারের মধ্যে পড়ে। এগুলোই আলিমদের বিতর্কের ক্ষেত্র। সুতরাং এসবের ক্ষেত্রে সব ধরনের ইজতিহাদের সুযোগ রয়েছে; চাই তা সার্বিক ক্ষেত্রে কিংবা বিশেষ ক্ষেত্রে। সাধারণ ইজতিহাদ হোক কিংবা শর্তযুক্ত ইজতিহাদ; অগ্রাধিকারমূলক ইজতিহাদ হোক কিংবা সৃজনশীল ইজতিহাদ।

আমাদের ফিকহি জ্ঞানসম্ভারের অধিকাংশ বিধান নিয়ে বিভিন্ন মতাদর্শ ও মাজহাবের মাঝে বিতর্ক রয়েছে। কেননা, বিধান উদ্ঘাটনের ক্ষেত্রে ফকিহগণের নানান দৃষ্টিকোণ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। দৃষ্টিকোণের বিভিন্নতার কারণেই এ বিতর্ক হয়েছে। এ ধরনের বিধানাবলির ক্ষেত্রে সামসময়িক মুজতাহিদের এই সুযোগ রয়েছে—তিনি নানান মতামত থেকে বাছাই করে ওই মতামত গ্রহণ করবেন, যা অধিক সঠিক। তা ছাড়া দলিলের বিবেচনায় অধিক শক্তিশালী এবং শরিয়ার উদ্দেশ্য ও উম্মাহর কল্যাণের সঙ্গে অধিক সংগতিপূর্ণ। এ ধরনের ইজতিহাদকে চয়নমূলক ইজতিহাদ বলা হয়।

আরেক প্রকারের ইজতিহাদ হলো—সৃজনশীল ইজতিহাদ। নিত্যনতুন সৃষ্ট অনেক সমস্যা রয়েছে, যেগুলোর সমাধান পূর্ববর্তী ফকিহগণ পেশ করেননি। কেননা, সে যুগে এ সকল সমস্যা সৃষ্টি হয়নি; বরং তখন তাদের নিকট বিষয়গুলো অকল্পনীয় ছিল।

পূর্ববর্তী ফকিহগণ যেভাবে তাদের যুগে সৃষ্ট সমস্যার সমাধান পেশ করার জন্য ইজতিহাদ করেছেন, ঠিক তেমনই নব সৃষ্ট এ সকল সমস্যার শরিয়ী সমাধান পেশ করার জন্য ইজতিহাদ করা এখনকার ফকিহগণের দায়িত্ব। যেমন : এখন তো অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, রাজনৈতিক ও চিকিৎসা-সংক্রান্ত বহু নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। তারা যদি মেহনত করেন—শরিয়ার প্রশস্ত ময়দানে এবং ফিকহের সজীব অঙ্গনে প্রতিটি সমস্যার সমাধানসহ প্রতিটি রোগের উপযোগী প্রতিষেধক পাওয়া সম্ভব।

ইসলামি রেনেসাঁকে সঠিক পথে পরিচালিত করা

ইসলামি রেনেসাঁকে সঠিক পথে পরিচালিত করা এবং এর পথচলাকে বিচ্যুতিমুক্ত রাখার জন্য আমার বেশ কিছু গ্রন্থ ও পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। যেগুলোর মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছে দ্বীনি দাওয়াতকে সঠিক পথে পরিচালনা করার নানান আলোচনা। তন্মধ্যে সর্বশেষ লেখা *আস-সাহওয়াতুল ইসলামিয়া মিনাল মুরাহাকা ইলার রুশদ* আমার দৃষ্টিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বইটি লেখার উদ্দেশ্য ছিল, ইসলামি রেনেসাঁর যেন অগ্রগতি ঘটে। অর্থাৎ, ইসলামি রেনেসাঁ বয়ঃসন্ধি তথা স্বপ্ন, কল্পনা, উন্মত্ততা ও আবেগের স্তর থেকে সাবালকত্ব তথা সচেতনতা, গম্ভীরতা, যুক্তিনির্ভরতা ও পরিপক্বতার স্তরে উন্নীত হয়। উম্মাহর রেনেসাঁ সঠিক পথে পরিচালনার জন্য নিম্নোক্ত ১০টি বিষয় অবলম্বন করতে হবে। এর মাধ্যমে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব হবে।

১. বাহ্যিক রূপ ও আকৃতির পরিবর্তে বাস্তবতা এবং মৌলিকত্বের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে।
২. বিবাদ-বিতর্ক ছেড়ে দান ও কর্মসম্পাদনের প্রতি মনোযোগী হতে হবে।
৩. আবেগ, হইচই ছেড়ে যুক্তিনির্ভরতা ও বৈজ্ঞানিকতার দিকে ধাবিত হতে হবে।
৪. অপ্রধান, গৌণ বিষয়ের পরিবর্তে প্রধান ও মূল বিষয়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে।
৫. কঠোরতা ও দূরে সরানোর পরিবর্তে সহজতা ও সুসংবাদনীতি গ্রহণ করতে হবে।
৬. স্থবিরতা ও অনুকরণপ্রিয়তা বর্জন করে ইজতিহাদ ও সংস্কারের দিকে যেতে হবে।
৭. গোঁড়ামি ও নিশ্চলতার পরিবর্তে উদারতা ও সচলতার দিকে যেতে হবে।
৮. বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ি বর্জন করে সমতা ও মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে হবে।
৯. সহিংসতা ও নির্দয়তা বর্জন করে কোমলতা ও সুহৃদ মানসিকতা অবলম্বন করতে হবে।
১০. বিরোধ-বিদ্বেষকে পেছনে ফেলে সম্প্রীতি এবং পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে।

উক্ত গ্রন্থে উপরিউক্ত ১০টি বিষয়ের বিশদ আলোচনা করেছি। আর কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বিশ্লেষণ করেছি এর মৌলিকত্ব। যেন এর মর্ম সুস্পষ্টরূপে ফুটে ওঠে। দলিল প্রতিষ্ঠিত হয়। বাস্তব বিষয়াবলি অসার বিষয়াবলির সাথে মিলে না যায়। অনবহিত ব্যক্তি যেন অবগতি লাভ করতে পারে। সন্দিহান ব্যক্তি তুষ্ট হতে পারে। অহংকারী ব্যক্তি মাথা নত করতে বাধ্য হয়। আর যে ধ্বংস হওয়ার, সে জেনেশুনে ধ্বংস হয়; যে বেঁচে থাকার, সে জেনেশুনে বাঁচতে পারে।

আমার বড়ো আকাঙ্ক্ষা, আমাদের দ্বীনি দাওয়াত যেন উপরিউক্ত ১০টি বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে। বিশেষত, বর্তমান যুগে এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কেননা, ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহকে সহিংসতা, সন্ত্রাস, বাড়াবাড়ি, গোঁড়ামি, আত্মকেন্দ্রিকতা, পরধর্মাবলম্বীদের বর্জন ইত্যাদি অপবাদের দায়ে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে।

আমাদের জন্য শত্রুদের দাবি ও অপবাদকে উপেক্ষা করে চলা সম্ভব নয়। কারণ, আমরা চাই বা না চাই, তাদের কণ্ঠ দারাজ। তাদের কথা ও দাবি সহজেই দুনিয়ার আনাচে-কানাচে পৌঁছে যায়। অতএব, আমাদের দায়িত্ব হলো— নিজেদের সুরক্ষা দেওয়া। পাশাপাশি মূল বক্তব্য তুলে ধরা আর ইসলামের বার্তা সর্বত্র পৌঁছে দেওয়া।

সামসময়িক দাঈদের জন্য এ গ্রন্থটি পাঠ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। তা ছাড়া উল্লিখিত গ্রন্থটি বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের পরিপূরক। আবার এও বলা যেতে পারে, বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি উল্লিখিত গ্রন্থের পরিপূরক। আমি যদি কয়েক দশক যাবৎ ইসলামি রেনেসাঁকে সঠিক পথে পরিচালিত করার কাজে জড়িত না থাকতাম, হয়তো উক্ত গ্রন্থটির নাম *আল খিতাবুল ইসলামি মিনাল মুরাহাকা ইলার রুশদ* রাখতাম। যেহেতু আমি এ কাজেই জড়িত ছিলাম, তাই বর্তমান নামটিকেই প্রাধান্য দিয়েছি। যাহোক, গ্রন্থের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নামের মাধ্যমেই স্পষ্ট।

কুরআনের ভাষায় দ্বীনি দাওয়াত

দ্বীনি দাওয়াতের কুরআনিক রূপরেখা

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে দ্বীনি দাওয়াতের রূপরেখা বিবৃত করে বলেন—

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ-

‘তুমি (মানুষকে) তোমার রবের পথে ডাকো হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে তর্ক করো উত্তম পন্থায়।’^{১৮}

এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও তাঁর উম্মতকে সম্বোধন করা হয়েছে। কেননা, দ্বীনের পথে মানুষকে দাওয়াত দেওয়ার দায়িত্ব কেবল নবিজির ওপর নয়; বরং উম্মতের ওপরও অর্পণ করা হয়েছে। তারা নবিজির বর্তমান-অবর্তমানে এ দায়িত্ব পালন করবে। এ প্রসঙ্গে কুরআনের আরেকটি আয়াতে নবিজিকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে—

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي-

‘তুমি বলে দাও—এটা আমার পথ, আমি স্পষ্ট জ্ঞানের ভিত্তিতে আল্লাহর দিকে ডাকি এবং যারা আমার অনুসরণ করেছে, তারাও।’^{১৯}

সুতরাং যে ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর অনুসরণ করেছে, পছন্দ করেছে আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে, মুহাম্মাদ (সা.)-কে নবি ও রাসূল হিসেবে, সে-ই মূলত আল্লাহর পথের দাঈ। সে-ই আল্লাহর পথে মানুষকে ডাকবে স্পষ্ট জ্ঞানের ভিত্তিতে। কেননা, কুরআনের সুস্পষ্ট ভাষ্য হলো—

أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي-

‘আমি স্পষ্ট জ্ঞানের ভিত্তিতে আল্লাহর দিকে ডাকি এবং যারা আমার অনুসরণ করেছে, তারাও।’^{২০}

এর পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়—এই উম্মাহকেও বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর জন্যও সে দায়িত্ব দিয়েই পাঠানো হয়েছে, যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল নবিজিকে। সুতরাং এই উম্মাহ নবিজির দাওয়াতের বাহক এবং রিসালাতের ধারক। এ দিকে ইঙ্গিত করেই তিনি বলেছেন—‘তোমাদের সহজ ও বিনম্র আচরণের জন্য পাঠানো হয়েছে; কঠোর আচরণ করার জন্য পাঠানো হয়নি।’^{২১}

সাহাবি রিবয়ি ইবনে আমের (রা.) পারসিক বাহিনীর সেনাপতি রুস্তমকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন—‘আল্লাহ তায়ালা আমাদের পাঠিয়েছেন, আমরা যেন মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে এক আল্লাহর দাসত্বে নিয়ে আসি। পৃথিবীর সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে পৃথিবীর প্রশস্ততায় নিয়ে আসি। ভ্রান্ত ধর্মসমূহের অবিচার থেকে উদ্ধার করে ইসলামের ন্যায়-ইনসাফের ছায়ায় আশ্রয় প্রদান করি।’

^{১৮} সূরা নাহল : ১২৫

^{১৯} সূরা ইউসুফ : ১০৮

^{২০} সূরা ইউসুফ : ১০৮

^{২১} সহিহ বুখারি : ২২০; সুনানে আবু দাউদ : ৩৮০

আমি মনে করি—সূরা নাহলের উপরিউক্ত আয়াতটি থেকে আমরা ইসলামের আহ্বান ও দ্বীনি দাওয়াতের আদর্শ রূপরেখা সম্পর্কে অবগত হতে পারব।

দ্বীনি দাওয়াতের আদর্শ রূপরেখা

কুরআনুল কারিম দ্বীনি দাওয়াতের পথ ও পদ্ধতির ব্যাপারে কিছু ওসিলা নির্ধারণ করেছে, যা একজন মুসলিম দাঈকে তার দায়িত্বপালন ও ইসলামের বাণী পৌঁছে দিতে সহযোগিতা করবে। কুরআন নিজ অলৌকিক শক্তিবলে অল্প কয়েকটি শব্দের মাধ্যমে সে ওসিলাগুলো বিবৃত করেছে। ওসিলাগুলো নিম্নরূপ—

দাওয়াত দেওয়া প্রতিটি মুসলিমের দায়িত্ব : দ্বীনি দাওয়াতের আদর্শিক রূপরেখার প্রথম মাইলফলক হলো—ইসলামের দাওয়াত দেওয়া প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ। এটা আল্লাহ তায়ালার নির্দেশেরও অন্যতম দাবি। প্রত্যেক মুসলমানই দাওয়াতের কাজের জন্য আদিষ্ট—চাই সে যে পন্থায়ই এ কাজ করুক না কেন! আল্লাহ তায়ালা বলেন—

أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعْنِي-

‘আমি স্পষ্ট জ্ঞানের ভিত্তিতে আল্লাহর দিকে ডাকি এবং যারা আমার অনুসরণ করেছে, তারাও।’^{২২}

তবে ব্যক্তিভেদে এর সক্ষমতা আর সম্ভবপরতার বিবেচনায় দাওয়াতের ধরন ও পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। কেউ এক বা একাধিক গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিতে পারেন। কেউ কোনো বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে বক্তৃতা করে দাওয়াত দিতে পারেন।

কেউ মসজিদে জুমার খুতবা প্রদান কিংবা দ্বীনি বিষয়ের পাঠদানের মাধ্যমে দাওয়াত দিতে পারেন। কেউ চাইলে ভালো কথা, সুন্দর সাহচর্য কিংবা উত্তম-অনুকরণীয় জীবনাদর্শের মাধ্যমে দাওয়াত দিতে পারেন।

আবার কেউ দাঈদের জন্য অর্থ ব্যয় করে, তাদের লিখিত গ্রন্থ ইত্যাদি প্রকাশ কিংবা কোনো দাওয়াতি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমেও দাওয়াত দিতে পারেন। কেননা, আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন—‘যে ব্যক্তি কোনো জিহাদকারীকে আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করে দিলো, সে তো জিহাদই করল।’^{২৩}

এই হাদিসের ওপর কিয়াস করে আমরা বলতে পারি—যে ব্যক্তি কোনো দাঈকে আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করে দিলো, সে যেন দাওয়াতই দিলো।

আল্লাহ প্রদত্ত জীবনব্যবস্থার অনুসরণের দাওয়াত : দ্বীনি দাওয়াতের আদর্শ পন্থার রূপরেখার দ্বিতীয় মাইলফলক হলো—একজন দাঈর অন্তরে এ বিশ্বাস থাকবে, সে আল্লাহর পথে মানুষকে

^{২২} সূরা ইউসুফ : ১০৮

^{২৩} সহিহ বুখারি : ২৮৪৩; সহিহ মুসলিম : ১৮৯৫

ডাকছে। অর্থাৎ, সে এমন এক জীবনব্যবস্থার দিকে মানুষকে আহ্বান করছে, যা আল্লাহ তায়ালা মানুষের হিদায়াতের জন্য দান করেছেন।

এর মাধ্যমে মানুষ উত্তমরূপে তার রবের ইবাদত করতে পারে এবং পারস্পরিক লেনদেন সুন্দর করতে পারে। এর ফলে পার্থিব জীবন তো সুখময় হবেই এবং পরকালেও সে উত্তম প্রতিদান লাভ করবে।

একজন মুসলিম মানুষকে নিজের দিকে আহ্বান করে না, তার সম্প্রদায় বা দলের প্রতিও আহ্বান করে না; বরং সে আহ্বান করে তার একমাত্র রবের দিকে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ-

‘কোনো মানুষের জন্য সংগত নয় যে, আল্লাহ তাকে কিতাব, হিকমত ও নবুয়ত দান করবেন আর সে মানুষকে বলবে—তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে আমার বান্দা হয়ে যাও।’^{২৪}

সে কোনো মানবরচিত জীবনব্যবস্থা বা পার্থিব দর্শনের প্রতি আহ্বান করে না। আবার সম্রাট, বাদশাহ, রাষ্ট্রপতি বা শাসনকর্তার নির্দেশে রচিত কোনো আইনের প্রতিও আহ্বান করে না; বরং সে আহ্বান করে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করার। ইসলামের দৃষ্টিতে কোনো মানুষের এ অধিকার নেই—সে মানুষের জন্য স্বাধীনভাবে কোনো স্থায়ী বিধান প্রবর্তন করবে, যা ইচ্ছা হালাল করবে এবং যা ইচ্ছা হারাম করবে। ইতিহাসের কোনো এক পরিক্রমায় আহলে কিতাবের ক্ষেত্রে এ ঘটনা ঘটেছিল। কুরআনুল কারিম অত্যন্ত কঠিন ভাষায় এর নিন্দা করেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالسَّيِّحِ ابْنِ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ-

‘তারা আল্লাহর পরিবর্তে নিজেদের আহবার (ইহুদি ধর্মগুরু) এবং রাহিবদের (খ্রিষ্টান বৈরাগী) খোদা বানিয়ে নিয়েছে এবং মাসিহ ইবনে মারইয়ামকেও। অথচ এক আল্লাহ ছাড়া তাদের অন্য কারও ইবাদত করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। তিনি ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। তাদের অংশীবাদীসুলভ কথাবার্তা থেকে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র।’^{২৫}

মানুষের জন্য সময় চলে এসেছে—তারা মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করবে, মানুষের প্রভুত্বকে প্রত্যাখ্যান করবে। সকলে এক আল্লাহর বান্দা হয়ে যাবে, যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন; আকাশমণ্ডলী ও ভূমণ্ডলের সবকিছুকে তাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন এবং তাদের ওপর প্রকাশ্য ও গুপ্ত নিয়ামতসমূহ বর্ষণ করেছেন। এ কারণেই আহলে কিতাব রাজা-বাদশাহদের উদ্দেশে প্রেরিত নবিজির চিঠি এ আয়াত দ্বারা সমাপ্ত করা হয়েছে—

^{২৪} সূরা আলে ইমরান : ৭৯

^{২৫} সূরা তাওবা : ৩১

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا
يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ^ط

‘হে আহলে কিতাব! তোমরা এক কথার দিকে এসো, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই রকম। (আর তা এই যে) আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করব না। তাঁর সঙ্গে কোনো কিছুকে শরিক করব না এবং আল্লাহকে ছেড়ে আমরা একে অপরকে রব বানাব না।’^{২৬}

হিকমত ও সদুপদেশের মাধ্যমে দাওয়াত : দাওয়াতের আদর্শ পন্থার তৃতীয় মাইলফলক হলো—মুসলিমসহ সব ধরনের মানুষকে দুটি পদ্ধতিতে দাওয়াত দেবে; একটি হলো হিকমত আর অপরটি হলো সদুপদেশ।